এবং নাট্যকথা

ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য স্মারক গ্রন্থ

সম্পাদনা

সৌমিত্র কুমার চ্যাটার্জী

নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ

EBONG NATYAKATHA
Edited by Soumitra Kumar Chatterjee
Published by Rubi Chattopadhyay,
Natya Katha Prakashan Bibhag

প্রথম প্রকাশ
আগষ্ট, ২০১৪

গ্রন্থস্বত্ব : শংকর ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ : শুভময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ISBN : 978-93-83200-95-5

₹ 300.00
দাম : ৩০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : ধ্যানবিন্দু
আলাপ : ৯৮৩৬৫৫৪২০৩

পরিবেশক : পাতাবাহার পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ
বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ, ২১ই এম. এম. ফিডার রোড কলকাতা-৭০০০৫৭, থেকে রুবী চট্টোপাধ্যায়, আলাপ : ৯০৫১১১১৭২৪ কর্তৃক প্রকাশিত এবং তনুশ্রী প্রিন্টার্স ২১বি রাধানাথ বোস লেন কলকাতা-৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্যের জীবন ও রচনা পরিচিতি
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ১১

বাংলা পৌরাণিক নাটকের পালাবদল
সৌমিত্র বসু ১৭

নাট্য—সৃষ্টি ও সংযোগ
মেঘনাদ ভট্টাচার্য ২৬

থিয়েটর ও ফিল্ম্
অনীত রায় ৩০

তৃপ্তি মিত্রের নাট্যরচনা
পবিত্র সরকার ৪৪

শেকসপিয়ার—বোধের সন্দীপক অনুবাদের সংশয়
চন্দন সেন ৫০

'মালিনী' : একটি পাঠপ্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে কিছু ছিন্ন ভাবনা
সিদ্ধার্থ সেন ৫৮

যাত্রা ও নাটক ১৯৬৬ থেকে ১৯৮৫
তরুণ কুমার দে ৭১

কালিদাসের নাটক
রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ৮৮

গৃহপ্রবেশ : সুষুপ্তির অন্ধকারে নারীর অস্ফুট প্রেম
প্রীতিপ্রভা দত্ত ৯৫

নতুন নাট্যকারের সন্ধানে : শিশির কুমার
প্রভাত কুমার দাস ১০২

শিল্পীর কাজ হল রুচি সৃষ্টি করা
মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৯

দানীবাবুর কথা
অপূর্বকুমার দে
৩১৪

'ডাকঘর'
অভিষেক মুষিব
৩২৩

বাংলা অ্যাবসার্ড নাটক : একটি রূপরেখা
কুন্তল মিত্র
৩২৮

বর্হিবঙ্গের নাট্যচর্চায় বাঙ্গালীরা
শৈলেন সাহা
৩৩১

রবীন্দ্র রচনায় ঐতিহাসিকতা-অনৈতিহাসিকতা : প্রেক্ষিত রাজর্ষি-বিসর্জন-দালিয়া
তারক সেনগুপ্ত
৩৪৭

A hermeneutic way to read natyashastra by monk Bharat
Music as abstraction in Natyashastra
গৌতম চট্টোপাধ্যায়
৩৭৯

'ডাকঘর'

অভিষেক মুসিব

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন তাঁর জীবনের একটি মাত্র পালা, আর সে পালার নাম দেওয়া যেতে পারে *'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা'*। সীমার মধ্য দিয়েই তিনি অসীমকে পেতে চান। কবির জীবনদেবতাই তার সমগ্র জীবনটিকে প্রাণের পালের উপর প্রেমের হাওয়া লাগিয়ে কালমহানদীর ঘাটে ঘাটে নিরুদ্দেশ যাত্রায় কবিকে নিয়ে চলেছে। ছোটবেলা থেকেই প্রেম সম্পর্কিত ভাবনা রবীন্দ্র কবিমানসে অন্য মাত্রায় বিরাজিত ছিল। প্রেম বলতে তিনি বুঝেছিলেন যথার্থ হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন যার সঙ্গে আত্মার আত্মিক সম্পর্ক। 'যথার্থ দোসর' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—*"প্রেম একটি পাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।... একটি হৃদয়ের জন্য একটি হৃদয় গঠিত হইয়া আছে। তাহার পরস্পর পরস্পরের জন্য। শতক্রোশ ব্যবধানে, এমনকি জগৎ হইতে জগতান্তরের ব্যবধানেও তাহাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ থাকে। তাহাদের মধ্যে দেখাশুনা হউক বা না হউক, জানাশুনা থাকুক বা না থাকুক, তাহাদের উভয়ের মধ্যে যেমন সম্বন্ধ তেমন কোন দুই পরিচিত ব্যক্তির কোন দুই বন্ধুর মধ্যে নাই।"* রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল'-এর কাহিনিতে যথার্থ দোসর ভাবনারই প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। বনবালা কমলা ও বিজয়ের সংসারে নীরদ ভালোবেসেছিল কমলাকে আর কমলাও ভালোবাসল নীরদকে। তাদের নীরব ভালোবাসায় একদিন এল রুঢ় অপ্রত্যাশিত আঘাত। বন্ধু বিজয়ের তিরস্কারে নীরদ যখন তাদের গৃহ ছাড়তে উদ্যত সেই সময় কমলা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে নীরদকে জানিয়ে দেয় আমি তোমাকে ভালোবাসি বলে নিষ্ঠুর বিজয় তোমাকে দূর করে দিলেও বিজয় কোনদিনও আমার ভালোবাসা পাবে না। আর শেষে বন্ধু বিজয়ের প্রতিহিংসায় নীরদ মৃত্যুবরণ করলে শশ্মানে নীরদের মৃত্যুশয্যার সামনে দাঁড়িয়ে কমলা নিজের বৈধ্যবকে ঘোষণা করেছে—

"আজিকে কমলা যে রে হয়েছে বিধবা।"

রবীন্দ্রনাথ দাম্পত্য প্রেমকে স্বীকার করেননি। তিনি প্লেটোনিক প্রেমে বিশ্বাসী। প্লেটোনিক প্রেমিক যাহা অন্বেষণ করে তা আসলে ভোগের পদার্থ নয়, নারীর শরীর নয়, প্রজননের আকাঙ্খা নয়, তার কাছে ভালোবাসা হল নিজের হারানো অর্ধেক সত্তাকে খুঁজে বেড়ানো এবং খুঁজে পেয়ে নিজেকে পরিপূর্ণ করে তোলা। অর্থাৎ নিজের সত্তার প্রার্থিত পূর্ণতাই হল প্লেটোনিক প্রেমের মূল অন্বেষণ। শারীরিক আকাঙ্খা প্রেমের মূল কথা নয়। মানসী কাব্যগ্রন্থের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় কবির এ অনুভূতি আরো বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে—

লও তার মধুর সৌরভ
দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ,
মধু তার কারো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী—
চেয়ো না তাহারে।

কারণ কবি জানেন মানুষের আত্মা আকাঙ্খার ধন নহে, দুটি হাত দিয়ে কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না।

'ডাকঘর' নাটকে অমল একজন কল্পনা বিলাসী বালক। সুধা নিতান্ত একজন সাধারণ বালিকা। প্রতিদিন মালা গাঁথবার জন্য সকালবেলা তাকে ফুল তুলতে যেতে হয়। প্রথম দর্শনেই অমলকে দেখে সুধার মনে হয় যেন সকালবেলাকার তারা। অমল সুধার ফুল তোলার সঙ্গী হতে চায়, কিন্তু কবিরাজের নিষেধ এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অমল চায় সুধা তাকে মনে রাখুক। অমল এবং সুধার যে সম্পর্ক তা ঠিক প্রেমের সম্পর্ক নয়, দুটো বালক-বালিকার হৃদয়ের অদ্ভুত আদান প্রদান মাত্র। নাটকের শেষে দেখা যায় সুধা যখন অমলকে ডাকে তখন অমল চিরনিদ্রায় শায়িত থাকে। অমল মুক্তির পথে চলে গেলেও পৃথিবী যেমন তাকে মনে রাখবে তেমনি সুধাও তার প্রেমকে জীবনের মধ্য দিয়ে স্মৃতির ভাণ্ডারে অমলকে অক্ষয় করে রাখবে। জানায় অমলকে সে ভালোনি। সুধা তার অণুভূতিকে শেষ পর্যন্ত মানবীয় প্রেমকে অতিক্রম করে অনন্তে উপলব্ধিতে নিয়ে গেছে। যা সর্ব বিশ্বচরাচরে ব্যপ্ত হয়েছে। প্রেমের আলোকে সুধা অনন্ত অমৃতলোককে আবিষ্কার করতে পেরেছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম আত্মনিবেদনের নয়, আত্মসম্প্রসারণের। এক বিশেষ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁর স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকের প্রথম দশকে প্রচুর অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন ছিলেন। এই কয়েকবছরের মধ্যে তিনি নিজের পরিবারে মৃত্যুর মিছিল দেখেন। বিশেষ কাতর অবস্থায় তিনি গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য-এর আত্মনিবেদনের গানগুলি লেখেন। দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের আস্থা সম্পর্কে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ১৯১২ খ্রিঃ রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বার বিলেত যান। এইসময় ইউরোপে গিয়ে তিনি দেখেন ইউরোপ সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। সেখানে দেখেন ইমাজিস্ট আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসাবাদের যুগ চলে এসেছে, ভিক্টোরিয়ান যুগ অবসন্ন। দেখলেন

সমস্ত জগৎ গতিশীল, সচল। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় অচলায়তন নাটক লিখলেন যেখানে সমস্ত জড়ত্বকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ডাকঘরের রচনার সময়কালও এই সময়। এই সময় থেকে চলমানতার ধারণা রবীন্দ্রনাথের নাটকে, গানে আসছে। রবীন্দ্রনাথ জড়ত্বের ধারণাকে একেবারে মুছে ফেললেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জড়তাই মৃত্যু, গতিই জীবন। কবির কাছে দুঃখের তত্ত্ব ও সৃষ্টির তত্ত্ব একসঙ্গে বাঁধা, এই দুটো মিলিয়েই আমাদের পূর্ণাঙ্গ জীবন। তাই রবীন্দ্র কবিচেতনায় বারবার মৃত্যুতত্ত্ব ও দুঃখতত্ত্ব প্রকাশ পেলেও তার মধ্যে দিয়েই তিনি প্রেমকে প্রবাহিত করে নিয়ে গেছেন জগত থেকে জাগতান্তরে। মৃত্যুশোক কবিকে যে দুঃখ দিয়েছে সেই দুঃখের মধ্য থেকেই তিনি বিশ্বজগতে আলোর সন্ধান পেয়েছেন। হাসি কান্নায় নিরেট করে বোনা জীবনটার একটা প্রান্ত যখন মৃত্যু এসে একেবারে শূন্য করে দিয়ে যায় তখন অনুভব করেন যে প্রিয়জনকে কাছে পাওয়া এবং ধরে রাখাটাই একমাত্র সত্য নয় বরং অপ্রত্যাশিতভাবে চলে যাওয়া এবং ছেড়ে দেওয়াটাই সমানভাবে সত্য। অমলকেও সুধা ধরে রাখতে পারেনি। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের যেতে নাহি দিব' কবিতায় মানবজীবনের এই চিরন্তন সত্য ব্যক্ত হয়েছে—

"এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন, 'যেতে নাহি দিব'। হায়
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।"

সবচেয়ে বড় সত্য এই মৃত্যুর কাছে প্রেমকে হেরে যেতে হয় তা সত্ত্বেও প্রেম মৃত্যুর সঙ্গে বার বার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ হতে চায়। আর এখানেই প্রেম বিজিত থেকেও কোথায় যেন জয়ের মুকুট লাভ করে। অমল তার মত্যুর মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকা জীবনের জটিলতাগুলি সুধাকে চিরদিনের জন্য মুক্তি দিয়ে গেল। অমল বেঁচে থাকবে সুধার স্মৃতিসত্তায়। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে দেখি, একদিন লাবণ্য অমিতকে জিজ্ঞাসা করেছিল—*"আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে কর না যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হল, সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্য শাজাহান খুশি হয়েছিলেন? তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্য এই মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সবচেয়ে বড় প্রেমের দান।"* অমর স্থাপত্য কীর্তির জন্য তাজমহলের কোন গৌরব নেই, প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন বিরহ প্রেমিক-প্রেমিকা যখন তাজমহলকে দেখে তাদের স্বীয় প্রেমিক প্রেমিকাকে স্মরণ করবে সেখানেই তাজমহলের কৃতিত্ব সেখানেই তাজমহলের সৌন্দর্য।

'ডাকঘর' নাটকে সুধা যখন অমলের জন্য ফুল নিয়ে আসে তখন অমল চিরনিদ্রায় শায়িত থাকে। রাজকরিবাজকে সুধার প্রশ্ন- ও কখন জাগবে? অমল জাগলে তাকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয় সুধা তাকে ভোলেনি। উল্লেখ্য এখানে মৃত্যুর কথা আছে কিন্তু কোথাও মৃত্যু কথাটির উল্লেখ হয়নি। আসলে মানুষ জীবনের স্থানুত্বের মধ্যেই মৃত্যুকে দেখে। মৃত্যু জীবনের শেষ নয় বরং সৃষ্টির প্রেরণা। অমলের চিরনিদ্রায় সুধার জীবনে নিদারুন আঘাত এসে থাকলেও আমরা কোথাও তার কোন প্রকাশ দেখতে পাইনি। সুধা সময় ও জীবনের

ব্যক্ততায় নিজেকে ব্যাপৃত করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিজীবনেও এই ভাবনার প্রকাশ করে গেছেন। তিনি তাঁর পুত্র শমীন্দ্রনাথকে খুব স্নেহ করতেন। শমীর মৃত্যুতে কবির মনে নিদারুণ আঘাত আসে কিন্তু কোথাও তার প্রকাশ দেখা যায় না। কবি নিজেই বলেছেন—"শমী যে রাত্রে চলে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আস্‌তে আস্‌তে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে কোথাও কিছু কম পড়ছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে পড়ে নি সমস্তের মধ্যে সবই রয়ে গেছে আমিও তার মধ্যে। সমস্তের জন্য আমার কাজও বাকি রইল।"

মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের কাছে জড়তা তাই তিনি মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে নিয়ে গেছেন। ডাকঘরের সুধাকেও অমলের কাছ থেকে জীবনের দিকে নিয়ে গেছেন। বিচ্ছেদ বেদনা যতই মর্মান্তিক হোক, কালের অতল জলে বিস্মৃতির পথ ধরে স্মৃতির সঞ্চয়গুলিও একদিন অদৃশ্যলোকে লুপ্ত হবে। জীবন সত্যের আমোঘ বিধানে একদিন সে দেখবে—

হায় রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।

অমলের মুক্ত আত্মা জন্ম জন্মান্তরের পথে পাড়ি দিয়েছে। আর সুধা তার নিজের জীবনর প্রতি অন্ধ আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে অমলকে মনে রেখেই বিশ্বজীবনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নিয়েছে। সুধা জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছে। 'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"পৃথিবীর এমন কোন্‌খানে আমরা পদক্ষেপ করিতে পারি যেখানে মৃত জীবের সমাধি নাই। কিন্তু পৃথিবীর দ্বার অবারিত। পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয়, জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাই-বোনের মত খেলা করে।"

জীবনের মৃত্যু স্বাভাবিক তাই মৃত্যুতে ভেঙে পড়ার মত কিছু নেই। কল্পনা কাব্যগ্রন্থে কবি তাঁর মানসপ্রতিমার উদ্দেশে বলেছেন—

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারি করেছি রচনা;
তুমি আমারি যে তুমি আমারি
মম অসীম গগন বিহারী।

রবীন্দ্রনাথ তিয়াত্তর বৎসর বয়সে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে জানান—"জীবনে যখন কোনো বড়ো শোক আসে তখন মনে করতে পারিনে কালে তার ক্ষয় হতে পারে। নিজের কাছে নিজের শোকের একটা অভিমান আছে।...আমাদের কাছে প্রিয়জনের মৃত্যুর একটিমাত্র দাবি, সে বলে মনে রেখো। কিন্তু প্রাণের দাবি অসংখ্য, মনকে সে অহোরাত্র নানাদিক থেকেই আকর্ষণ করতে থাকে। দাবির সেই উপস্থিত ভিড়ের মধ্যে মৃত্যুর একটিমাত্র আবেদন টিকতে পারে না।..."

ডাকঘর নাটকে অমলও চেয়েছিল সুধা যেন তাকে মনে রাখে। বলাকা কাব্যগ্রন্থের

শাহাজান' কবিতায় দেখি সম্রাট শাহাজান মমতাজের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশে গড়ে তুললেন অমর স্মৃতিসৌধ তাজমহল। তারপর একদিন প্রবাহমান কালের ধারায় তিনি ও তাঁর সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও তাঁর অমর কীর্তি তাজমহল যুগে যুগে বহন করে চলেছে সেই চিরবিরহীর মর্মবাণীকে—*'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া'*। কিন্তু শিল্পের পক্ষে একটি মুহূর্ত ধরা থাকলেও জীবনের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কারণ জীবনের ধর্ম হল গতি। রবীন্দ্রতত্ত্বেও *'যে প্রেম সম্মুখপানে চলিতে চালাতে নাহি জানে'* সে জীবনের দোসর নয়। আর যে প্রেম মানুষের প্রেরণারূপে নিত্য ক্রিয়াশীল সে প্রেম মানুষকে নিত্যই চলার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ 'পথপ্রান্তে' প্রবন্ধে বলেছেন—*'প্রেম আমাদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আপন হইতে অন্যের দিকে লইয়া যায়, এক হইতে আর একের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এইজন্য তাহাকে পথের আলো বলি।'* প্রেমের এই সত্য ছবি 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ছবি কবিতায় আরও স্পষ্ট করা হয়েছে—

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই;
আজ তাই
শ্যামলে শ্যামলে তুমি; নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

সুধা জীবনের চলার পথে প্রেমের দোসর হিসাবে অমলকে মনে রাখবে, কোন কীর্তি বা সৌধ স্থাপনের মধ্য দিয়ে নয়। আর এভাবে চলতে চলতে একদিন সুধার নিভৃত অন্তরে অমল প্রাণের প্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠবে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. রবীন্দ্র জীবনকথা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
২. আত্মজীবনী : জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ—শিশিরকুমার দাস।
৩. আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—আবু সয়ীদ আইয়ুব।
৪. রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে—কবিশেখর কালিদাস রায়।
৫. কবিমানসী ১ম খণ্ড—জগদীশ ভট্টাচার্য।
৬. কবিমানসী ২য় খণ্ড—জগদীশ ভট্টাচার্য।
৭. জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮. বলাকা সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা- নাট্যব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ১৪১৭।
৯. কালের যাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক-শঙ্খ ঘোষ।

□ নাট্যপ্রাবন্ধিক।